গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধন ও সুষ্ঠু নির্বাচন

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক; ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসন্ন। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী ডিসেম্বরেই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কেননা, সংবিধান অনুযায়ী সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সংবিধানের ১২৩ এর ২। (৩)-এর (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ''মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে'' নির্বাচন করার বিধান রয়েছে। এই বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী আগামী ৩১ অক্টোবর ২০১৮ থেকে ২৮ জানুয়ারি ২০১৯-এর মধ্যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। কেননা দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৯ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে – যে দিন থেকে মেয়াদ গণনা শুরু হয়েছে। তবে সংবিধানের ১২৩ এর ২। (৩)-এর (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ''মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে'' এই নির্বাচনের বিধান রয়েছে। নির্বাচন কমিশন থেকেও এমনটাই বলা হচ্ছে যে, ৩০ অক্টোবর ২০১৮-এর পর যেকোনো দিন নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হবে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রণীত আমাদের সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। কিন্তু এই জনগণ বা মালিকরা সরাসরি রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নেয় না। মালিকরা রাষ্ট্র পরিচালনা করে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে। তারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে নিজেদের স্বার্থে, নিজেদের কল্যাণের জন্য। আর এই জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের পদ্ধতিই হচ্ছে নির্বাচন। এই পদ্ধতি যদি সঠিক হয়, তবে প্রকৃত জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন। আর যদি সঠিক প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধি নির্বাচিত না হয়, তবে মালিকরা তাদের প্রকৃত প্রতিনিধি পান না। সেক্ষেত্রে জনগণ তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে একথা বলা যায় না। তাই, সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। সঙ্গত কারণেই দেশের সাধারণ নাগরিকদের মত নাগরিক সংগঠন 'সুজন'ও চায় এই নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হোক।

সুষ্ঠু নির্বাচন করতে আমরা আন্তর্জাতিকভাবেও অঙ্গীকারাবদ্ধ। কারণ আমরা 'সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ' ও 'ইন্টারন্যাশনাল কভেনেন্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস'-এ স্বাক্ষরদাতা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে এসব আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তিও মেনে চলতে হয়। আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি অনুযায়ী সুষ্ঠু নির্বাচনের কতগুলো মানদণ্ড রয়েছে। মানদণ্ড গুলো হচ্ছে: (ক) ভোটার হওয়ার উপযুক্ত সকল ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছেন; (খ) যেসব ব্যক্তি প্রার্থী হতে আগ্রহী, তাঁরা প্রার্থী হতে পেরেছেন; (গ) প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের ফলে ভোটারদের সামনে বিকল্প প্রার্থী ছিল; (ঘ) ভোট প্রদানে আগ্রহীরা নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছেন; (ঙ) ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা সঠিকভাবে হয়েছিল এবং (চ) পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া ছিল স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত, অর্থ ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য।

সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়টি নির্ভর করে একটি যথাযথ নির্বাচনী আইন ও এর কঠোর প্রয়োগের ওপর। আমরা জানি যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মূল আইন **'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২'** সংশোধনের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী আমরা জানতে পেরেছি যে, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামত উপেক্ষা করে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের সংশোধনী প্রস্তাব গত ২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে ভেটিং-এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। আমরা আরও জানতে পেরেছি যে, ভেটিং-এর জন্য প্রেরিত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবসমূহ হচ্ছে:

- আসনভিত্তিক রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ ও তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান;
- ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার;
- খেলাপী ঋণ পরিশোধের শর্ত শিথিল করা;
- প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ সংশ্লিষ্টদের বদলির ক্ষমতা ইসির হাতে অর্পণ;
- অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের বিধান সংযোজন;
- মনোনয়নপত্র গ্রহণের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ রাখা;
- ১২ ডিজিটের আয়কর সনদ জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি ইত্যাদি।

আমরা 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের কাছে ২০১৭ সালে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দাখিল করেছিলাম। প্রস্তাবসমূহের মধ্যে নির্বাচনী আইন সংক্রান্ত প্রস্তাসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

(১) আইনে 'না-ভোটে'র বিধানের পুনঃপ্রবর্তন; যাতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের কাউকেই যদি কোনো ভোটারের পছন্দ না হয়, তবে সেক্ষেত্রে তিনি যেন 'কাউকেই না' এমন ইচ্ছার প্রতিফলন ব্যালটে রাখতে পারেন। উল্লেখ্য, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাররা 'না ভোট' প্রদানের সুযোগ পেলেও, নবম জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় বিধানটি বিলুপ্ত হয়। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ভারতের নির্বাচনী আইনে 'না ভোটে'র বিধান সংযোজিত হয়েছে।

(২) মনোনয়নপত্র অনলাইনে দাখিলের বিধান সংযোজন; যাতে যে সকল প্রার্থী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে গিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিলের বিষয়টি ঝুকিপূর্ণ মনে করেন, তারা যেন ঘরে বসেই অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেন। অতীতে বিভিন্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, মনোনয়নপত্র ছিনিয়ে নেয়া বা কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলা অথবা সম্ভাব্য প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র জমাদানে বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায়, তার পক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিল করা সম্ভব হয়নি।

(৩) জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা ও আয়কর বিবরণী দাখিলের বিধান সংযোজন; যা এখন পর্যন্ত বাধ্যতামূলক নয়।

(৪) গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রতিটি দলের তৃণমূল পর্যায়ের সদস্যদের (নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন স্তরের সদস্য) সম্মতির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রার্থীকে নিয়ে একটি প্যানেল তৈরি এবং এই প্যানেলের মধ্য থেকেই কেন্দ্র কর্তৃক মনোনয়ন চূড়ান্তকরণের বিধান সংযোজন, যাতে প্রার্থী মনোনয়নে তৃণমূলের মতামত গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ২০০৮ সালে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে প্রত্যেক সংসদীয় আসনের জন্য একটি প্যানেল তৈরি করার এবং সেটি থেকে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড মনোনয়ন দেওয়ার বিধান ছিল। পরবর্তীতে অধ্যাদেশটি সংসদে অনুমোদনের সময় এ বিধানের পরিবর্তন আনা হয়। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ডকে আর তৃণমূলে তৈরি প্যানেল থেকে মনোনয়ন দিতে হবে না, বোর্ডকে তা শুধুমাত্র বিবেচনায় নিতে হবে। এতে তৃণমূলের মতামত উপেক্ষিত হচ্ছে এবং মনোনয়ন বাণিজ্য দিন দিন বেড়ে চলেছে।

(৫) রাজনৈতিক দলের সকল স্তরের কমিটির সদস্যদের (প্রাথমিক সদস্যসহ) নামের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও নিয়মিত আপডেট করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি; যাতে কাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনয়ন এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহের বিভিন্ন স্তরের কমিটি গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তা সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে দৃশ্যমান থাকে।

(৬) রাজনৈতিক দলের সকল কমিটিতে ২০২০ সালের মধ্যে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব রাখার বিধানটি বিবেচনায় রেখে মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট সংখ্যক নারীকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন প্রদানের বাধ্যবাধ্যকতা সৃষ্টি করা; যাতে করে প্রতিটি রাজনৈতিক দল নির্দিষ্ট সংখ্যক নারীকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিতে বাধ্য হয়।

(৭) হলফনামার ছকে পরিবর্তন আনা; যাতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রার্থীর জন্ম তারিখ ও বয়স; একাধিক পেশার বিবরণ; দ্বৈত নাগরিকত্ব; নির্ভরশীলদের তালিকা; দেশে ও বিদেশে থাকা অস্থাবর বা স্থাবর সম্পদের বর্তমান মূল্যসহ বিবরণ ইত্যাদি তথ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

(৮) হলফনামার তথ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যাচাই-বাছাই-এর বিধান বাধ্যতামূলক করা এবং অসত্য ও বিভ্রান্তমূলক তথ্য প্রদানকারীদের শাস্তির আওতায় আনার বিধানটির প্রয়োগ নিশ্চিত করা; যাতে সকল প্রার্থীর হলফনামার তথ্যসমূহ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আবশ্যিকভাবে যাচাই করে অসত্য ও বিভ্রান্তমূলক তথ্য প্রদানকারীদের শাস্তি কার্যকর করা হয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে আরপিও'তে অসত্য তথ্য প্রদানের জন্য মনোনয়ন বাতিলের ক্ষমতা প্রদান করা হলেও, নির্বাচন কমিশন কখনই নির্বাচনের পূর্বে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেনি।

(৯) নির্বাচনী ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে প্রার্থীদের জামানতের পরিমান কমানো (সর্বোচ্চ ১০,০০০.০০ টাকা), নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীদের পোস্টার ছাপানো, হলফনামার তথ্য ভোটারদের মাঝে বিতরণ, প্রার্থী পরিচিতি সভা আয়োজন ইত্যাদি বিধান সংযোজনসহ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়; যাতে প্রার্থীরা ইচ্ছা করলেও অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের সুযোগ না পান। প্রার্থীদের ব্যয় মনিটরিং-এ কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

(১০) দ্রুততার সাথে নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ন্যূনতম সময় নির্ধারণ করে দেয়াসহ বিশেষ নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান সংযোজন; যাতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচনী বিরোধের নিষ্পত্তি হয়।

(১১) সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন; যাতে আজগুবি এবং অসত্য সংবাদ প্রকাশ থেকে সোশ্যাল মিডিয়াকে বিরত রাখা যায়।

(১২) মনোনয়নপত্র দাখিলের সাথে সাথেই হলফনামা, আয়কর সংক্রান্ত তথ্য ও মনোনয়নপত্র-সহ সকল তথ্যাদি নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশের বিধান সংযোজন; যাতে গণমাধ্যম কর্তৃক প্রার্থীদের তথ্যের ওপর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশসহ যারা প্রার্থীদের তথ্য নিয়ে কাজ করতে চায়, তারা তা সহজেই করতে পারে।

(১৩) স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার জন্য মনোনয়নপত্রের সাথে ১% ভোটারের সমর্থনসূচক স্বাক্ষর জমাদানের বিধান বাতিল করা। কেননা **প্রথমত** এই বিধান একদিকে ভোটারদের ভোটপ্রদানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তার ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক। **দ্বিতীয়ত** বর্তমানে আট লক্ষাধিক ভোটার সম্বলিত নির্বাচনী এলাকাও রয়েছে; উক্ত এলাকার ১% ভোটার অর্থ আট হাজারের অধিক ভোটার - যা সংগ্রহ বাস্তবসম্মত নয়। অতীতে প্রভাবশালী প্রার্থী কর্তৃক সমর্থক তালিকাভূক্ত কারো ওপর চাপ সৃষ্টি করে, তাকে দিয়ে রিটার্নিং অফিসারের কাছে, **"স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক হিসেবে প্রদত্ত স্বাক্ষর আমার নয়"** মর্মে দরখাস্ত করিয়ে প্রার্থীতা বাতিল করানোর অভিযোগও রয়েছে।

(১৪) নিবন্ধনের শর্ত যৌক্তিকতার নিরীখে শিথিল/পরিবর্তন করতে হবে। অভিযোগ রয়েছে যে, রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে সুনামের অধিকারী একাধিক সংগঠনকে ঠুনকো ছুতো দেখিয়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধন প্রদান করা হয়নি। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে নিষ্ক্রিয় ও অপরিচিত সংগঠনকেও নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। প্রতি পাঁচ বছর পর পর নিবন্ধন প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টিও গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা জাতীয় নির্বাচন থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি পাঁচ বছর পর পর নিবন্ধন প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে, অনেক নির্বাচনেই দলীয় পরিচয় ও প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে অনেক সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক দল। সে কারণে নিবন্ধনের প্রদানের বিষয়টি হওয়া উচিত একটি চলমান প্রক্রিয়া।

শুধুমাত্র উপরোল্লেখিত বিষয়সমূহই নয়, নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাধীন, শক্তিশালী ও কার্যকর সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা-সহ অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের ওপর গুরুত্বারোপ করা জরুরি বলে আমরা মনে করি।

- **কমিশনারদের নিয়োগে আইন প্রণয়নঃ**
  আমাদের সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে প্রধান নির্বাচন কমিশনার-সহ নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের জন্য আইন প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নের প্রায় ৪৬ বছর পরেও সেই আইন প্রণীত হয়নি। আমরা মনে করি, আইনটি প্রণয়ন একান্ত জরুরি। শুধুমাত্র কমিশনারদের নিয়োগই নয়, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের নিয়োগের জন্য পৃথক ক্যাডার সৃষ্টি করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

- **ভোটার তালিকাঃ**
  ২০০৮ সালে সেনাবাহিনীর সহায়তায় একটি ছবিযুক্ত সঠিক ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যে তালিকায় পুরুষের তুলনায় ১৪ লাখের বেশি নারী ভোটার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যতবার ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে, ততবারই 'জেন্ডার-গ্যাপ' দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ পুরুষ ভোটারের তুলনায় নারী ভোটারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়েছে। তাই ভবিষ্যতে ভোটার তালিকা প্রণয়নের সময় বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিতে হবে।

- **সীমানা পুনর্নির্ধারণঃ**
  নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণও নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কয়েকটি সুস্পষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে তা করা হয়, যার একটি হলো সংসদীয় আসনগুলোতে ভোটার সংখ্যায় যতদূর সম্ভব সমতা আনা। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ৮৭টি নির্বাচনী এলাকায় সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়ছে এবং এরফলে ভোটার সংখ্যায় অসমতা আরও বেড়েছে, যা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড উভয়েরই লঙ্ঘন। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের ক্ষেত্রেও একই ধরনের সমস্যা রয়ে গিয়েছে। এবারের নির্বাচনের জন্য প্রাসঙ্গিকতা না থাকলেও ভবিষ্যতের জন্য বিষয়টি ভাবতে হবে।

একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে যে বিষয়গুলো সন্নিবেশিত রয়েছে, তার যথাযথ প্রয়োগে নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট তৎপর না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, আরপিও'র ৯০(গ) ধারা অনুযায়ী, **নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের বিদেশি শাখা থাকা বেআইনি,** যা রাজনৈতিক দলগুলো অমান্য করে চলছে। নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে **রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন বিলুপ্ত করার বিধান আরপিওতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে,** যার প্রতি রাজনৈতিক দলগুলো ভ্রুক্ষেপও করছে না। ভ্রুক্ষেপ করছে না নির্বাচন কমিশনও।

শুধু এক্ষেত্রেই নয়, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রাজনৈতিক দলসমূহ পরিচালিত হচ্ছে কি-না, সম্মেলন ঠিক সময়ে আয়োজন করা হচ্ছে কি-না, তা তদারক করা হচ্ছে না। এমনকি বিভিন্ন নির্বাচনে হলফনামার ছক ঠিকভাবে পূরণ করা না হলেও বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়। অবস্থাদৃষ্টে একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, নির্বাচন কমিশন তাদের রেগুলেটারি ভূমিকা পালন করছে না।

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের যে ধরনের সংশোধনী প্রস্তাব ভেটিং-এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে, যদি তা পুরোপুরিভাবেও অনুমোদিত হয়, তবে সেই আরপিও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ নির্বাচনী আইন হিসেবে পরিগণিত হবে না – এতে অনেক ঘাটতি থেকে যাবে। যেহেতু প্রস্তাবসমূহ মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়ে সংসদে এবং সংসদ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ভিত্তিক স্থায়ী কমিটি হয়ে সংসদে এসে অনুমোদিত হবে; তাই এক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ এবং সংসদ সদস্যবৃন্দ এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমরা মন্ত্রিপরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ এবং সংসদ সদস্যবৃন্দের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি যে, নির্বাচন কমিশনকে প্রকৃত অর্থেই একটি স্বাধীন, শক্তিশালী ও কার্যকর সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলাসহ সুষ্ঠু নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে তারা নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবগুলোর সাথে 'সুজন'-এর প্রস্তাবসমূহ বিবেচনায় নিয়ে একটি সমন্বিত প্রস্তাব প্রণয়ন করবেন এবং জাতীয় সংসদ কর্তৃক তা অনুমোদনের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবেন।

আমাদের আকাঙ্ক্ষা, 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২' সংশোধনের ক্ষেত্রে 'সুজন'-এর প্রস্তাবসমূহ সংযোজিত হবে এবং একটি সময়োপযোগী পরিপূর্ণ 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ' আমরা পাবো। তবে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যেহেতু ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, তাই এই নির্বাচনে এটি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উচিত। শুধুমাত্র আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর অনেক দেশেই ইভিএম নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কোনো কোনো দেশে ইভিএম ব্যবহার শুরু করেও পুনরায় তারা পূর্বাবস্থায় ফিরে গিয়েছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন, লেভেল প্লেইং ফিল্ড, সংসদ বহাল রেখেই নির্বাচন, কোনো কোনো বিরোধী দলের কর্মীদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তারি শুরু করা, বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি পালনে প্রতিবন্ধকতা, ইভিএম ব্যবহার, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিতর্ক ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। আমরা মনে করি, সুষ্ঠু ও সহিংসতামুক্ত নির্বাচনের স্বার্থে এসকল বিতর্কের অবসান হওয়া জরুরি। এজন্য প্রয়োজন স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে আলাপ-আলোচনা এবং সমঝোতায় উপনীত হওয়া। অতীতে অনেকবার সংকট নিরসনে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে আলোচনা ও সমঝোতার উদ্যোগ আমরা দেখেছি। ১৯৯০ সালে সংকট নিরসনে রাজনৈতিক সমঝোতার একটি অনন্য দৃষ্টান্ত ছিল তিন জোটের রূপরেখায় স্বাক্ষর; যা পরবর্তীতে বাস্তবায়িত না হওয়ায় বার বার আমরা সংকটের আবর্তে আবর্তিত হচ্ছি।

পরিশেষে আমরা এই আশাবাদ ব্যক্ত করতে চাই যে, রাজনৈতিক দলসমূহ দ্রুততার সাথে সংলাপে মিলিত হবে এবং আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে একটি 'জাতীয় সনদ' বা সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করবে। আর এই সংলাপের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলকে। আমাদের প্রত্যাশা, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য।